যায়যায়দিন | তারিখ 11 JUL 2008 | পৃষ্ঠা ৬ | কলাম ৬

ডেমরার বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারের পাওনা আড়াই কোটি টাকা

সাধীয়া খান

ডেমরার বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারের আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ২ কোটি ৩৯ লাখ ৭৩ হাজার ৪৪৪ টাকা। প্রভাষক হয়েও সহকারী শিক্ষকের বেতন গ্রহণ এবং স্টাফিং প্যাটার্ন বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন অবৈধভাবে গ্রহণ করায় এ অর্থ ফেরত পাবে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

১২ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত তদন্ত দল স্কুলটিতে তদন্ত কাজ করেন। তদন্তে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োগ জালিয়াতি, এক পদে থেকে পাশাপাশি অন্য পদের বেতন উত্তোলন, স্টাফিং প্যাটার্ন বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন গ্রহণ, নির্মাণ খাতে দুর্নীতিসহ নানা অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তদন্তে যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান অধিকারীকে চাকরি দেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদন্তে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের একাধিক সহকারী শিক্ষক পরবর্তীতে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরও সহকারী শিক্ষকের সরকারি বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করেছেন। বিধি বহির্ভূতভাবে এ অর্থ গ্রহণ করায় সরকার গোলাম আহাদের কাছে ২ লাখ ২৭ হাজার ২৩৮ টাকা, লুৎফুন্নাহারের কাছে ১ লাখ ১৪ হাজার ৬৪৪, মোঃ এহসানুল হকের কাছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৭৮৯, মোঃ গোলাম মাওলার কাছে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৪৪৮, মোঃ মুজিবুর রহমানের কাছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৬ এবং মোঃ কামরুল আহসানের কাছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৬ টাকা পায়। এর মধ্যে এহসানুল হক সহকারী শিক্ষক থেকে প্রভাষক পদে নিয়োগ পান। কিন্তু তার নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়ায় সরকার তার কাছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৬৫ টাকা ফেরত পাবে।

প্রভাষক হয়েও সহকারী শিক্ষকের বেতনের সরকারি অংশ গ্রহণ করেছেন একাধিক শিক্ষক

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটিতে ভূগোল বিষয়ের অনুমতি না থাকলেও এ বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল স্বপন কুমার মণ্ডলকে। তিনি প্রভাষক পদে নিয়োগ পাওয়ার পরও সহকারী শিক্ষকের বেতন গ্রহণ করেন। এ কারণে সরকার স্বপন কুমার মণ্ডলের কাছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৬ টাকা পায়। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে তিনি আবার সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে কম্পিউটার শিক্ষার কোনো অনুমতি না থাকলেও এ বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয় মোঃ মোক্তার হোসেনকে। অনুমতি ছাড়া বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও তিনি বেতন উত্তোলন করেছেন। এ কারণে তার কাছে সরকার পায় ৪ লাখ ২০ হাজার ১৯৩ টাকা। প্রতিষ্ঠানটিতে ন্যূনতম যোগ্যতা ছাড়া নিয়োগ দেয়া হয় হিসাবরক্ষক সিরাজুল ইসলামকে। তার নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়ায় সরকার তার কাছে পায় ৪ লাখ ৪২ হাজার ৭০২ টাকা। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির স্টাফিং বহির্ভূত ৬৮ শিক্ষক-কর্মচারীর কাছে সরকার ফেরত পায় প্রায় দুই কোটি টাকা।

তদন্তে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যয়ের ভাউচার গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদন করা হয় না। বিধি বহির্ভূতভাবে অধ্যক্ষ ব্যয়ের ভাউচার নিজেই অনুমোদন করেন। বড় বড় ব্যয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান না করে স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ব্যয় করেন। এছাড়া সাবেক অধ্যক্ষ কর্তৃক মেরামতের নামে ভুয়া বিল-ভাউচার দিয়ে ৫ লাখ ৩ হাজার ২০০ টাকা আত্মসাৎ করারও প্রমাণ পাওয়া যায় তদন্তে।

তদন্তে বলা হয়, ২০০২ সালের আগস্টে আবুল কাশেম ভূঞা অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেলেও তিনি ২০০৭ সালের এপ্রিলে সাময়িক বরখাস্ত হন। তদন্ত চলাকালে তিনি খোরপোষ ভাতা গ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত ফাইল না থাকায় তার নিয়োগসংক্রান্ত রেকর্ড, সব যোগ্যতার সনদ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার সনদ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভূইয়া আবদুর রহমান দেখাতে পারেননি।

তদন্ত রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানটির নানা অনিয়মের চিত্র ফুটে উঠেছে। এখনো প্রতিষ্ঠানটিতে নানা অনিয়ম চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে দলীয়করণ প্রকটভাবে চলছে। ক্লাস বণ্টনে ব্যাপক পক্ষপাতিত্বও করছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ভূইয়া আবদুর রহমান এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক আলী আসগর। তারা অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের অনুসারী শিক্ষকদের দিয়ে ভালো ভালো বিষয়ের ক্লাস নেয়া হচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকদের কথায় কথায় শোকজ এবং মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে বলেও তারা অভিযোগ করেন।